রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব - ৬

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো গল্প-উপন্যাসও কল্যাণী বা গৃহবন্দী নারীর স্তব। নারীর বেদনা স্থান পেয়েছে তাঁর কথা সাহিত্যে, তবে তা প্রেমহীনতার বেদনা, নারীর স্বায়ত্তশাসনহীনতার বেদনা নয়। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারীর রূপও একেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাকে তিনি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। ... ... রবীন্দ্রনাথের নারী জৈবিক। জৈবিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে নারী মানুষ হয়ে ওঠে নি; তার কাজ সন্তান ধারণ আর লালন ক’রে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা। পুরুষের কাজ সভ্যতা সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের নারীর মূল কাজ যেখানে গর্ভধারণ আর প্রসব, সেখানে পুরুষের কাজ হচ্ছে সভ্যতা সৃষ্টি; মৃনালিনী দেবীরা গর্ভ ধারণ করবে, টিকিয়ে রাখবে মানব প্রজাতিকে, আর রবীন্দ্রনাথেরা সৃষ্টি ক’রে চলবেন সভ্যতা!

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

ছক ভাঙা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করার সফল উদাহরণ চিত্রাঙ্গদা (১২২৯)। চিত্রাঙ্গদা ভিক্টোরীয় ঘরে বাইরে বা পৃথক এলাকা বা সহচরীতত্ত্বের এক নিরীক্ষা, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে নারী স্বাধীন স্বায়ত্তশাষিত হওয়ার অযোগ্য; সে হ’তে পারে বড়োজোর পুরুষের সহচরী। ভিক্টোরীয়রা নারীকে ততোটুকু শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলো, যতোটুকুতে তারা হ’তে পারে স্বামীর যোগ্য সহচরী;- নারী নিজে প্রধান হয়ে উঠবে না, পুরুষই থাকবে প্রধান, নারী পালন করবে সহকারী সহচরীর ভূমিকা। নারী যদি ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়ে, তবে তাকে ছকের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে যে-কোনো কৌশলে, বা ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে ঘরের কারাগারে। টেনিসনের প্রিন্সেস (১৮৪৭, ১৮৫৩) কাব্যে পাওয়া যায় এর আদর্শ ভিক্টোরীয় রূপ। ওই কাব্যে বিদ্রোহী স্বায়ত্তশাসনলিপসু রাজকন্যা আইডাকে ক’রে তোলা হয় স্বামীর পদানত, তার প্রতিষ্ঠিত নারী-বিশ্ববিদ্যালয়কে হাসপাতালে রূপান্তরিত ক’রে ওই বিদ্রোহিনীকে পরিণত করা হয় পুরুষের সেবিকা ও স্বামীর সহচরীতে। পুরুষতন্ত্র প্রতিশোধ নেয় চরমভাবে। চিত্রাঙ্গদার কাঠামো অভিন্ন, একটি বিদ্রোহী স্বাধীন রাজকন্যাকে এতে কামের সহযোগীতায় রূপান্তরিত করা হয় পুরুষের সহচরীতে। চিত্রাঙ্গদার শুরু ছক-ভাঙা নারীরূপে, আর তার বিলুপ্তি ঘটে ছকবদ্ধ নারীতে; ভিক্টোরীয় পুরুষতন্ত্রের তৈরী ছকে তাকে চমৎকারভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ, যাতে মুগ্ধ হয় পুরুষেরা, এবং উন্নতজাতের নারী-উৎপাদনবাদীরা। কাব্যনাটকটির যে-অংশ নারী-স্বাধীনতার বিভ্রান্তিকর শ্লোগান হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছে, তা হচ্ছে [চিত্রাঙ্গদা : ১১]

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমায় পাইবে তবে পরিচয়।

এখানে পাওয়া যাচ্ছে এক ভিক্টোরীয় চিত্রাঙ্গদাকে, যে স্বাধীন স্বায়ত্তশাষিত হওয়ার সমস্ত স্বপ্ন বাতিল ক'রে বেছে নিয়েছে সহচরীর ভূমিকা। সে দেবী নয়, দাসী নয়, তবে স্বাধীন সত্তাও নয়; সে পুরুষের সহচরী বা প্রিয় পরগাছা। সে নিজে যাবে না কোনো সংকটের পথে, নিজে করবে না কোনো দুরূহ চিন্তা, নিজে গ্রহণ করবে না কোনো কঠিন ব্রত; ওই সমস্ত কাজ পুরুষের, সে-সব করবে তার স্বামী, সে হয়ে থাকবে স্বামীর সহচরী, বা শিক্ষিত দাসী। রুশো-রাসকিন নারীকে দিতে চেয়েছিলেন এ-ধরনের শিক্ষাই। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল *রঘুবংশ*-এর '*প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ* শ্লোকটি, পছন্দ ছিলো স্ত্রীর সখি, সচিব, মিত্রের ভূমিকা; এর সাথে মিলে গিয়েছিলো ভিক্টোরীয় মতবাদ যে নারী হবে স্বামীর সহচরী। চিত্রাঙ্গদায় সহচরী নামের সুভাষিত দাসীর ভূমিকায় বিলুপ্তি ঘটে এক স্বায়ত্তশাষিত তরুনীর। চিত্রাঙ্গদার সাথে মিল আছে শেষের কবিতার (১৩৩৬) লাবন্যের; তাকেও চিত্রাঙ্গদার মতো ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লাবন্যের বাবা অধ্যক্ষ্য অবনীশ দত্ত মেয়েকে বিদুষী ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলো; কিন্তু মেয়েটি একদিন জ্ঞান বাদ দিয়ে জেগে উঠে কামের মধ্যে, যেমন জেগে উঠেছিলো চিত্রাঙ্গদাও। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের জ্ঞান সহ্য করেন না, তাদের জাগিয়ে তোলেন কামে বা প্রেমে-নারীত্বে; এবং মনে করেন এখানেই নারী জীবনের স্বার্থকতা। তবে ওই প্রেমই নারী জীবন'কে ব্যর্থ করে দেয়, নারী হয়ে ওঠে পুরুষের দাসী বা সহচরী। পুরুষতন্ত্রের শেখানো প্রেম নারীর জন্যে এক বড়ো সমস্যা।

রবীন্দ্রচিন্তায় পুরুষ অনন্য সত্তা, পুরুষ স্রষ্টা, ধ্যানী, শিল্পী; নারী গৌণ। সাতাত্তর বছর বয়সে লেখা 'নারী' [১৯৩৭, সানাই] নামের একটি কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশ এমন :

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দরসরূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরনীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমুর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।.....
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।.....
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে-
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি

বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

এর অর্থ আদিতে ছিলো পুরুষ, যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধী, স্বর্গের অধিবাসী। তখন নারী ছিল না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো পুরুষের অনন্ত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা নিয়ন্ত্রনের জন্যে, নারী দেখা দিয়েছিলো আনন্দরূপে। কে সৃষ্টি করেছিলো নারীকে? সৃষ্টি করেছিলো সম্ভবত পুরুষ নিজেই, পুরুষই নারীর বিধাতা, নারী পুরুষের ধ্যানলব্ধ মুর্তি। তবে নারী সে-মুর্তি আর আনন্দ ধ'রে রাখতে পারেনি, তাই পুরুষ শিল্পী হয়ে বারবার সৃষ্টি করেছে সে-মুর্তি। পৃথিবীতে নারী আছে, কিন্তু তারা পৃথিবীর শস্তা মদ, পুরুষ এ-মর্ত্যের মদেই আস্বাদ করার চেষ্টা করছে স্বর্গের সুধা। পুরুষ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে নানা শিল্পকলায় সৃষ্টি করছে আদি নারীকে। পৃথিবীতে যে-নারীরা আছে, তারা একদা অপূর্ব আলোতে উদ্ভাসিত ছিলো, এখন নেই। পুরুষ তাই চির বিরহী, তার স্বপ্নে আছে আদিনারী; পার্থিব নারী পুরুষের সহচরী মাত্র। এ-নারী পুরুষের সেবা করবে, গৃহকাজ করবে, পুরুষ একে সম্ভোগ করতে করতে স্বপ্ন দেখবে আদি ধ্যানমুর্তিটির! কাব্যিকভাবে একে স্বর্গীয় মনে হ'তে পারে, তবে গদ্যে বা বাস্তবে এ খুবই শোচনীয় ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো গল্প-উপন্যাসও কল্যাণী বা গৃহবন্দী নারীর স্তব। নারীর বেদনা স্থান পেয়েছে তাঁর কথা সাহিত্যে, তবে তা প্রেমহীনতার বেদনা, নারীর স্বায়ত্তশাসনহীনতার বেদনা নয়। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারীর রূপও একেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাকে তিনি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাঁর কোনোকোনো উপন্যাস, যেমন *দুই বোন* (১৩৩৯), লেখা হয়েছে দুই নারীতত্ত্ব-নারীর এক রূপ উর্বশী আরেক রূপ কল্যানী-প্রমাণের জন্যে; কোন কোন উপন্যাস, যেমন *ঘরে-বাইরে* (১৩২৩), *চার অধ্যায়* (১৩৪১), লেখা হয়েছে পৃথক এলাকাতত্ত্ব প্রমাণ করার জন্যে। তিনি বিশ্বাস করেন গৃহ আর ভালোবাসা পেলে এবং ভালোবাসতে পারলেই চরিতার্থ নারী জীবন। বাইরের জগত নারীর জগত নয়, সেখানে নারী প্রবেশ করলে শুভকে গ্রাস করে অশুভ, দেখা দেয় সর্বনাশ। প্রেমের ওপর চরম গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নষ্ট করেছেন নারীদের সম্ভাবনা। প্রেম নামক ভাবাবেগ নারীপুরুষের উভয়ের জীবনেরই খন্ডকালীন সত্য, কিন্তু প্রেমই জীবনের সাফল্য নয়; ভাবাবেগকাতর একটা সময় কেটে যাওয়ার পর পুরুষ প্রেমের জন্যে কাতরতা বোধ করে না, কিন্তু নারী কেন আত্মবিনাশ ঘটাবে ওই প্রেমেই? প্রেমকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে পুরুষতন্ত্রই, তবে পুরুষ নিজেকে তার গ্রাস থেকে মুক্ত রেখে নারীকে ঠেলে দিয়েছে প্রেমের করাল গ্রাসে। বাইরের জগত প্রেমের নয়, তা স্বাধীনতা ও সাফল্যের। ওই স্বাধীনতা ও সাফল্য রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন পুরুষের জন্যে, আর নারীকে গ্রস্ত ক'রে রেখেছেন প্রেমের ভাবালুতার মধ্যে। নারী হবে বাইরের সফল পুরুষের অনুরাগিনী। রবীন্দ্রনাথের নারীদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিদ্রোহী '*স্ত্রীর পত্র*'-এর (১৯১৪) মৃণাল। সে তার স্বামীকে জানিয়েছে, 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না'; কারণ সে জেনেছে 'সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা' কী। তবে সংসার ছেড়ে মৃণাল গিয়েছে শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে জগদীশ্বরের কাছে। পুরুষ যে ওই জগদীশ্বরের নামেই তাকে মেয়ে মানুষ ক'রে রেখেছে, তা জানে না মৃণাল। মৃণাল স্বামীর ঘরে ফিরে নাও আসতে পারে, তবে সে বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে না; তার বিদ্রোহ বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের নয়। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে পৃথক এলাকাতত্ত্ব প্রমাণের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বিমলার ওপর; এবং দেখিয়েছেন বাইরে গেলে নারী সর্বনাশ করে বাইরের ও ঘরের। বিমলার জীবন তখনি স্বার্থক যখন সে অবনত স্বামীপ্রেমে, আর ব্যর্থ যখন সে সাড়া দেয় বাইরের হাতছানিতে। *চার অধ্যায়* এ-তত্ত্বের আরেক নিরীক্ষা ও প্রমাণ। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের চোখে খুবই জঘন্য, আর তা চরম জগন্য হয়ে উঠে যখন তাতে যোগ দেয় নারী। নারী সন্ত্রাসে যাবে না, তারা যাবে প্রেমে; আর প্রেমের পবিত্র জায়গা হচ্ছে গৃহ, যেখানে নারী হবে তার স্বামীর খন্ডকালীন খেলার পুতুল ও আমরণ দাসী।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় (১৯১৭) প্রদত্ত বক্তৃতার একগুচ্ছ প্রকাশিত হয় *পারসনালিটি* (১৯১৭) গ্রন্থে। বইটির শেষ নিবন্ধের নাম 'নারী'। বইটি বাঙলাদেশে দুস্প্রাপ্য ব'লে আমি পড়ার সুযোগ পাইনি, তবে কেতকী কুশারী (১৯৮৫, ২৪৮-২৫৩) পশ্চিম ও নারী সম্পর্কে এ-বইতে রবীন্দ্রমতের যে-পরিচয় দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় এতে পশ্চিম ও নারী সম্পর্কে তাঁর পুরোনো ধারণারই (১৮৯১) পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। দ্বিতীয়বার তিনি যখন ইউরোপে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মনে মনে নিজেকে গণ্য করেছিলেন এক তরুণ ভারতীয় ঋষি ব'লে, এবং ইউরোপ সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন অনেক গ্রহণ অযোগ্য বাণী, তবে তখন পশ্চিম তাঁর বাণী শোনার জন্যে প্রস্তুত হয় নি। আমেরিকায় বক্তৃতার সময় তিনি নোবেলপ্রাপ্ত প্রাচ্যের পুরোহিত, যাঁর কথা টিকেট কেটে শুনতে চায় আমেরিকা, এবং তিনি পশ্চিমকে শোনান প্রচুর ভারতীয় কথামৃত। তিনি বলেন, পশ্চিম সভ্যতা বড় বেশি পুরুষালি হয়ে উঠেছে ব'লেই ভরে গেছে সংকটে। এ-সংকটের সমাধান হচ্ছে নারী : ' অবশেষে সে-সময় এসেছে, যখন প্রবেশ করতে হবে নারীকে, ক্ষমতার এ-বেপরোয়া গতির মধ্যে নারীকে সঞ্চারিত করতে হবে আপন জীবন ছন্দ ' [দ্র কেতকী (১৯৮৫, ২৪৮)]। রবীন্দ্রনাথ তিরস্কার করেছেন পুরুষ ও পশ্চিমের পুরুষালি সভ্যতাকে, কেননা পশ্চিমকে সমালোচনা করাই ছিলো তখন প্রাচ্য ঋষিত্ব; তবে তিনি তা করতে পারেন না, কেননা 'পুরুষ' বলতে তিনি বোঝেন যে অসমান্য ভাবকে, পশ্চিমের পুরুষ তা-ই। পুরুষ, রবীন্দ্রচেতনায়, কল্পনাপ্রতিভা, সৃষ্টি, গতি, অনন্ত অস্থিরতা, উদ্ভাবন, বিধাতা যাকে সম্পূর্ণ সৃষ্টি করতে পারেন নি ব'লে যে নিরন্তর সৃষ্টি ক'রে চলছে নিজেকে। তাই তিনি পশ্চিমের পুরুষদের নিন্দা করতে পারেন না, কেননা তারা করেছে পুরুষেরই কাজ। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু পশ্চিমকে বাণী শোনাতে গেছেন, তাই পশ্চিমের যে-পুরুষ কাজ করেছে তাঁরই আদর্শ অনুসারে, তাকেই তিনি আক্রমন করেছেন। তবে এ-বাহ্যিক আক্রমণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখি রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন আসলে নারীকেই, যারা নিজেদের জীবনছন্দ সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছে সভ্যতায়, তাই পশ্চিমের সভ্যতা ভ'রে গেছে সংকটে। রবীন্দ্রনাথের পুরুষধারণা '*নারী* ' (১৯৩৭) কবিতায় যেমন, গদ্যেও তেমনি; *পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি*তে (১৩৩৬) পুরুষ এমন :

পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয়নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পুর্ণ থাকতে হবে (রর : ১৯, ৩৭৯)।

গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায়; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন ক'রে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে (রর : ১৯, ৩৮০)।

রবীন্দ্রনাথের পুরুষধারণার সাথে পশ্চিমের পুরুষকে মিলিয়ে নিলে দেখি পাশ্চাত্য পুরুষ অন্যায় করে নি কোনো; তারা যা করছে, তাকেই পুরুষের কাজ ব'লে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। পুরুষ সন্ধান করবে, গতিবেগমত্ত হয়ে ছুটে চলবে, উদ্ভাবন করবে, নিজের অসম্পূর্ণ রূপটিকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলবে। তাই পশ্চিমে যদি কোনো সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা পুরুষের দোষ নয়, দোষ নারীরই; কেননা নারীই তার রবীন্দ্রকথিত 'জীবনছন্দ' সঞ্চার করতে পারে নি সভ্যতায়, গতিবেগমত্ত পুরুষকে শোনাতে পারেনি তার 'স্থিতির মূল সুর'। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নারীকে দোষী করতে চান না, দোষী করেন পশ্চিমের পুরুষকেই, কেননা তিনি দন্ড দিতে চান পশ্চিমা সভ্যতাকে। এটা খুবই অন্যায় দন্ড। রাসকিন বলেছিলেন পুরুষ যখন যুদ্ধ বাধায়, তার জন্যে পুরুষের চেয়ে নারীই বেশি দোষী; কেননা নারী তার নারীত্ব দিয়ে পুরুষকে শান্তির দিকে টেনে রাখতে পারেনি! রবীন্দ্রনাথও অনেকটা তাই বলেন, নারী সম্পর্কে তাঁর ধারণা রাসকিনের ধারণার মতোই। পুরুষ যোগাবে সভ্যতার গতি, নারী যোগাবে স্থিতি; তাহলে সভ্যতা হয়ে উঠবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ। পুরুষ গতি, তাই সে তার স্বাভাবিক গতিকে সঞ্চার করবে সভ্যতায়;

নারীর কাজ যদি হয় সভ্যতায় স্থিতি সঞ্চার করা, আর তা যদি না পারে নারী, তবে দন্ডপ্রাপ্য নারীরই। তাই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের সভ্যতার সংকটের জন্যে মূল দোষী করেছেন নারীকে, যদিও রবীন্দ্রনাথ তা অবধান করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতায় নারীর যে-ভূমিকা নির্দেশ করেন, তা হচ্ছে ছক-বাঁধা কল্যাণীর ভূমিকা, যার কাজ পুরুষকে গৃহের স্থিতির মধ্যে স্থিত ক'রে পুরুষের অনন্ত গতিকে ছন্দোবদ্ধ করা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'স্থিতির আদর্শ নারীর প্রকৃতি দ্বারা গভীর ভাবে সমাদৃত', নারীর কাজ হচ্ছে 'জীবনের পোষন, সংরক্ষণ ও আরোগ্যসাধন'। নারীর যে-প্রকৃতি ও ভূমিকা তিনি নির্দেশ করেছেন, নারীকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে গৃহে, আর তাকে পংক্তিভুক্ত ক'রে রাখে আদিম পশুরই সাথে। তিনি মনে করেন, নারীর দায়িত্ব ছিলো পশ্চিম সভ্যতার সেবিকারূপে আবির্ভূত হওয়া, নারী হবে সভ্যতার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কিন্তু নারী তা পারে নি। রবীন্দ্রনাথ নারীকে প্রকাশ্যে দোষী করেন নি; কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার সংকটের দায়ভার, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনছন্দ' ও 'স্থিতির মূল সুর' তত্ত্ব অনুসারে বইতে হচ্ছে নারীকেই। রবীন্দ্রনাথ আগের মতো এ-প্রবন্ধেও বলেন যে নারীর স্থান হচ্ছে গৃহ। রাসকিনের মতোই গৃহকে একটু সম্প্রসারিত করে বলেন, 'মানবিক জগতই নারীর জগত' [দ্র কেতকী (১৯৮৫, ২৮৪-২৮৫)]। তবে ওই মানবিক জগত গৃহেরই সম্প্রসারিত রূপ; সেখানে সেবা আছে, প্রীতি আছে, কল্পনাপ্রতিভা আছে, আবিষ্কার বা সৃষ্টি নেই।

রবীন্দ্রনাথের নারী জৈবিক। জৈবিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে নারী মানুষ হয়ে ওঠে নি; তার কাজ সন্তান ধারণ আর লালন ক'রে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা। পুরুষের কাজ সভ্যতা সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের নারীর মূল কাজ যেখানে গর্ভধারণ আর প্রসব, সেখানে পুরুষের কাজ হচ্ছে সভ্যতা সৃষ্টি; মৃনালিনী দেবীরা গর্ভ ধারণ করবে, টিকিয়ে রাখবে মানব প্রজাতিকে, আর রবীন্দ্রনাথেরা সৃষ্টি ক'রে চলবেন সভ্যতা। প্রাণসৃষ্টি এক দরকারি আদিম কাজ, সেটা সভ্যতাসৃষ্টি নয়, ওই কাজটি নারীর; ওই কাজ কাউকে মহৎ বা মানুষ করে না। পুরুষ করে সভ্যতাসৃষ্টির এক মহৎ কাজ; রবীন্দ্রনাথ বলেন, '*এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এই জন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলো। সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি* ' (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮০)। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'জীবনের পোষন, সংরক্ষন', তা কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, তাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর প্রধান সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতা থেকেই বহিষ্কার ক'রে দিয়েছেন নারীকে, তিনি মনে করেন সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের সৃষ্টি; এবং পুরুষ তা পেরেছে, কেননা পুরুষকে জীবন পোষন আর সংরক্ষণ করতে হয় নি। এ-সভ্যতা যে পুরুষতান্ত্রিক, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সভ্যতা শুধু পুরুষের সৃষ্টি নয়, নারী আছে এর ভিত্তিতে আর ওপরকাঠামোতে, কিন্তু পুরুষাধিপত্যবাদীদের মতো রবীন্দ্রনাথের তা মনে পড়ে নি। তিনি বলেন, 'প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটছে মনের তাড়ায়' (*পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮২*)। দুটি বিপরীত বস্তু পাচ্ছি এখানে : প্রাণ আর মন; নারী ওই প্রাণসৃষ্টি করতে গিয়ে চিরকালের জন্যে আটকে পড়েছে আঁতুড়ঘরে, আর মন চালিত হয়ে পুরুষ সৃষ্টি ক'রে চলছে সভ্যতা। এর অর্থ হচ্ছে নারী মনহীন প্রাণী, যার কাজ নিজের অভ্যন্তরে নতুন প্রাণ সৃষ্টি করা। নারী যেখানে জৈবস্তরে রয়ে গেছে, সেখানে পুরুষ উত্তীর্ণ হয়েছে অভিনব দেবতার স্তরে :

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। we are the dreamers of dreams - এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করছে।....নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে; তার ধৈর্য বেশী কেননা, তার ধারণা জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে

দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহুপীড়নের উপর স্থাপিত করেছে।.... পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হয়ে বসে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এই জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮৫-৩৮৬)।

এ-বর্ণনায় নারী সামান্য প্রাণী পুরুষের তুলনায়; নারীর রয়েছে তুচ্ছ প্রেম আর গৃহ, তাও পুরষেরি জন্যে; আর পুরুষের রয়েছে 'কল্পনাবৃত্তি', রয়েছে 'ধ্যানের দৃষ্টি', সে সৃষ্টি করে 'ধ্যানের শক্তি দিয়ে'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিলো ও'শনেসির 'আমরা সঙ্গীতরচয়িতা, /এবং আমরা স্বপ্নের স্বাপ্নিক' পংক্তিগুচ্ছ, অনেক স্থানে তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন কবির নাম না নিয়ে- মূল কবির নাম না নেয়া তাঁর স্বভাব (যেমন The Religion of Man -এ 'The Music Maker' পরিচ্ছেদে), এখানেও উল্লেখ করেছেন; এবং রবীন্দ্রনাথের পুরুষ হচ্ছে সঙ্গীতরচয়িতা, স্বপ্নের স্বাপ্নিক, তার ধ্যান পরিগ্রহ করছে নানা কীর্তির মধ্যে। পুরুষ তৈরি ক'রে চলছে নতুন পথ, সমগ্রের তৃষ্ণায় আর্ত তার প্রকৃতি, এবং সৃষ্টির জন্যে ধ্বংস করতেও পুরুষ দ্বিধাহীন [তাই দু-দুটি মহাযুদ্ধ এবং সভ্যতার সংকটের জন্যে রবীন্দ্রনাথ দায়ী করতে পারেন না পশ্চিমের পুরুষকে, কেননা তারা সৃষ্টির প্রয়োজনে আয়োজন করেছিলো প্রলয়ের]। এ-পুরুষের তুলনায় নারী একটি জরায়ু। পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক ভাববাদী মহত্ত্ব বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত :

(ক) *পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এই জন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলি চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন-এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে (পশ্চিমযাত্রী ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮১)।*

(খ) *পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কতদেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হল ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৮)।*

(গ) *পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা।.... পুরুষের রচিত সভ্যতায় আদিকাল থেকে এই রকম ভাঙা-গড়া চলছে ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৮)।*

(ঘ) *নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৯)।*

রবীন্দ্রনাথের পুরুষ নিরন্তর সক্রিয় দেবতা, সে বিধাতার থেকেও শক্তিমান; সে অবিরাম সৃষ্টি ক'রে চলছে নিজেকে, সম্পূর্ণ করছে বিধাতার অসম্পূর্ণ কাজ। রাসকিনের মতোই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ যে পুরুষ কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়, সংঘাত, ভাঙাগড়া; নারী হচ্ছে ওই দেবতার শান্তির পানীয়। রবীন্দ্র বিশ্বে নারীর প্রয়োজন বেশি নয়, পুরুওষকে সন্তান ও প্রেম দেয়ার জন্যে দরকার নারী। পুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভাববাদী ও পুরুষতান্ত্রিক।

পুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ধারণা, পুরুষ হয়েছে এজন্যে যে প্রাণ সৃষ্টিতে পুরুষের ভূমিকা ক্ষণউত্তেজনার; আর

নারী নারী হয়েছে ওই প্রাণ সৃষ্টি, পোষন আর সংরক্ষণ করতে গিয়েই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন আদিম শেকলে নারীকে বেঁধেছে প্রকৃতি, তাই নারী রয়ে গেছে প্রকৃতির আদিম স্তরে। নারীর এ-আদিমতার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, এমনকি ১৩৪৩-এ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মীসম্মিলনে যখন তিনি 'নারী' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, তখনও নারীদের তাদের আদিমতার কথা স্মরণ করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রচেতনায় নারী :

(ক) *জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষনের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮৩)।*

(খ) *প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষেরা তা পায়নি (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রর : ১৯, ৩৮৩)।*

(গ) *মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নারী সমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে তোষন করে।....প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারী হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমন তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্তভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৭)।*

(ঘ) *তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৮)।*

পারসন্যালিটিতে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের যে-কথা কেতকী কুশারীর (১৯৮৫, ২৪৮) অনুবাদে হয়েছে 'জীবনের পোষন, সংরক্ষণ ও আরোগ্যসাধন', তাকে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে (১৩৩৬) বলেছেন, 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণ'; এবং এ-ই হচ্ছে নারী মৌল কাজ। নারীর এ-কাজটি আদিম জৈবিক, এবং রবীন্দ্রনাথের মতে এটা উদ্দেশ্যহীন ঘটনা নয় : 'জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায়' নারীর মধ্যে 'চরম পরিণতি পেয়েছে'। নারী হচ্ছে প্রকৃতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জরায়ুসম্বলিত জীব। প্রকৃতি দ্বিধাহীনভাবে প্রাণসৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছে নারীকে। একথা তিনি ১৯১৭তে, ১৯১৯-এ, ১৯৩৬-এ বলেছেন; এবং এতে বিশ্বাস করেন যৌবন কাল থেকেই। ১৯৩৬-এ তিনি নারীদের সভায়ই বলেছেন, 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী'; নারী 'জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষন করে', 'প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে', এবং 'জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে।' নারী সন্তান ধারণ করে, প্রসব করে এটা সত্য; তবে রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে নারী সম্পর্কে তাঁর ভাববাদী পুরুষতান্ত্রিক ধারণা। পুরুষতন্ত্র এমন ধারণা পোষণ করে যে নারী পুরুষের থেকে অনেক বেশি 'প্রাকৃতিক'; ভারতীয় অঞ্চলে প্রকৃতি ও নারীর ভেদ অস্বীকার ক'রে নারীকে 'প্রকৃতি'ই বলা হয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে যে নারী অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত প্রকৃতির সাথে, তাই নারীর পক্ষে অসম্ভব প্রকৃতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। অন্যদিকে পুরুষের রয়েছে দ্বৈত প্রকৃতি : পুরুষ তার দ্বিতীয় প্রকৃতির সাহায্যেই সৃষ্টি করে সভ্যতা। পুরুষ সম্বন্ধে ভাববাদী ধারণা জোর দেয় পুরুষের এ-দ্বিতীয়

প্রকৃতির উপর, যেমন জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং পুরুষকে ক'রে তুলেছেন দেবতা। পুরুষতন্ত্র নারীর জন্যে নির্দেশ করেছে একক প্রকৃতি, যা জড়িত আদিম জৈবিকতার সাথে; আর পুরুষের জন্যে দ্বৈত প্রকৃতি, যার দ্বিতীয়টি পুরুষকে করেছে জৈবিকতা-পেরিয়ে যাওয়া মানুষ। এটা শুধু পুরুষতন্ত্রের দার্শনিকতা নয়, এর রয়েছে বাস্তব রূপ : এটা জীবনকে ভাগ করেছে দুটি পৃথক এলাকায়, একটি গার্হস্থ্য ও অন্যটি সামাজিক জীবন। পুরুষ জীবন যাপন করে দু-এলাকায়ই, তবে সামাজিক এলাকায় পুরুষ যাপন করে তার 'মানবিক' জীবন। গার্হস্থ্য জীবন হচ্ছে পুরুষের জৈবিক জীবন, আর সামাজিকটি তার মানবিক জীবন। গার্হস্থ্য জীবন হচ্ছে প্রকৃতির, প্রয়োজনের, অস্বাধীনতার জীবন, যেখানে বাস করে নারী; আর পুরুষ এ-জীবনকে পেরিয়ে সামাজিক জীবনে লাভ করে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা। নারী গার্হস্থ্য জৈবিকতার জীবনে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রকথিত 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষনের' জন্যে, এবং এটাকে তিনি ও পুরুষতন্ত্র একটা পাশবিক কাজ বলে মনে করেন। এর প্রভাব এতো প্রবল যে নারীবাদী দ্য বোভোয়ারও মনে করেছেন যে সন্তানধারণ ও প্রসব একটি হীন পাশবিক কাজ; এবং নারী অভিশপ্ত এ-জৈবিক অভিশাপে। এ অভিশাপের ফলেই নারী বন্দি হয়ে আছে গৃহে, আদিম প্রকৃতির শেকলে জড়িয়ে আছে; তার মুক্তি নেই। নারী বন্দি হয়ে আছে মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার অমানবিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই! শুলামিথ ফায়ারস্টোন এ-তত্ত্বটিকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, *নারী-অধিনতার মূল কারণ হয় যদি সন্তানপ্রজনন, তাহলে নারীমুক্তির জন্যে দরকার নারীর সন্তান ধারণ করতে অস্বীকার করা [দ্র ওব্রিয়েন (১৯৮২, ১০৪)]*। মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়; পুরুষ যদি চায় যে টিকে থাকুক মানবপ্রজাতি, তাহলে তাকে উদ্ভাবন করতে হবে সে-প্রযুক্তি, যা টিকিয়ে রাখবে মানবপ্রজাতিকে।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে গৃহে দেখতে চান, এবং সব সময় মনে করেছেন প্রকৃতিই নারীর মধ্যে নিজের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করার জন্যে এ-ব্যবস্থা। পুরুষই যে নারীকে ঢুকিয়েছে ঘরে, এ কথা তিনি স্বীকার করতে চান নি। ১৯৩৬-এ নারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এ-মত কিছুটা বদলান; স্বীকার করেন, *'মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারার বেড়া দিয়ে রেখেছে' ('নারী', কালান্তর, রর : ২৪, ৩৭৯)*। পুরুষকে এবার তিনি স্নেহের সাথে দায়ী করেন; এবং সাথে সাথে উচ্চারণ করেন এক সাংঘাতিক কথা : *'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেই জন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে' (ওই, ৩৭৯)*। অর্থাৎ নারীদের মধ্যে রয়েছে জন্মক্রীতদাসের বৈশিষ্ট্য, তাই পুরুষ পেরেছে নারীকে বন্দি করতে। পুরুষ যে-জন্যে গৃহে অবরুদ্ধ করেছে নারীকে, তা হচ্ছে 'হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্য', বা নারীত্ব, যা নারী পেয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীর থাকতেই হবে ওই গুন : *'প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না' (ওই, ৩৭৯)*। রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে ছকবাঁধা নারীত্ব নামের 'সহজ রসটি', যার অভাবকে তিনি মনে করেন 'দুর্ভাগ্য'। কোনো শিক্ষাই ওই রসাভাবের ক্ষতি করতে পারে না; নারী কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রধানমন্ত্রী হ'লেও বা নোবেল পুরুষ্কার পেলেও কিছু যায়-আসে না, ওই সব নারীর দুর্ভাগ্য মাত্র। তার সব সাফল্যই, রবীন্দ্রমতে, চরম ব্যর্থতা, যদি তার না থাকে ওই সহজ রসটি।

[চলবে]

{অনুলিখন : অনন্ত}